নাবিলা ইষ্ক

প্রেয়সীর হৃদয় ব্যাকুল

অরুর বয়স তখন কত হবে? বড়োজোর চৌদ্দ। উদাসীনতায় ভরতি মস্তিষ্ক। শ্যাওলা পড়া ছাদের প্রান্তরে নূপুর পরিহিত পদচারণ ফেলে বিচরণ চালাত। ঘুরেফিরে বেড়াত ঘরদুয়ার, বাগান, মাঠ-ঘাট। হরিণী, মায়াবী নয়নে পিটপিট করে অগোচরে চাইত। পাতলা ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে সাদা দাঁতগুলো চিকচিক করত হাসির তালে। দুলত প্রফুল্লবদন। কোমর সমান কালো কেশে দু-বিনুনি গেঁথে থাকত।

পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটা কী আর বুঝত তখন? কিচ্ছুটি নয়। চঞ্চল, নির্বোধ নাবালিকা অজান্তে হৃদয় দিয়ে বসল। যাকে দিল সে-মানব তার থেকে গুনে গুনে দশটি বছরের বড়ো। সম্পূর্ণ একটি জেনারেশনের গ্যাপ তাদের মধ্যে রয়ে গেল। বোঝ যখন হলো তখন তার কিশোরী হৃদয়ে মানবটি পাকাপোক্ত বসবাস শুরু করেছে। তাকে হৃদয় থেকে তাড়ানোর কোনো পথ জানা নেই। তাই যত্নসহকারে আগলে রাখতে শুরু করল একান্তচারী প্রণয়কুমারকে। কখনো কি বুঝবে প্রণয়কুমার অরুর কিশোরী মনের আকুলতা? আঁচ করতে কি পারবে, কীভাবে সে তার হৃদয় স্বার্থপরের মতো কেড়ে নিয়েছে? জানতে কি কখনো পাবে এই প্রেয়সীর হৃদয় তার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল?

সাদিত উজ-জামান

নবকথন

চেয়েও বলা যায় না তাকে,

বলতে গিয়েও বলা হয় না তাকে!

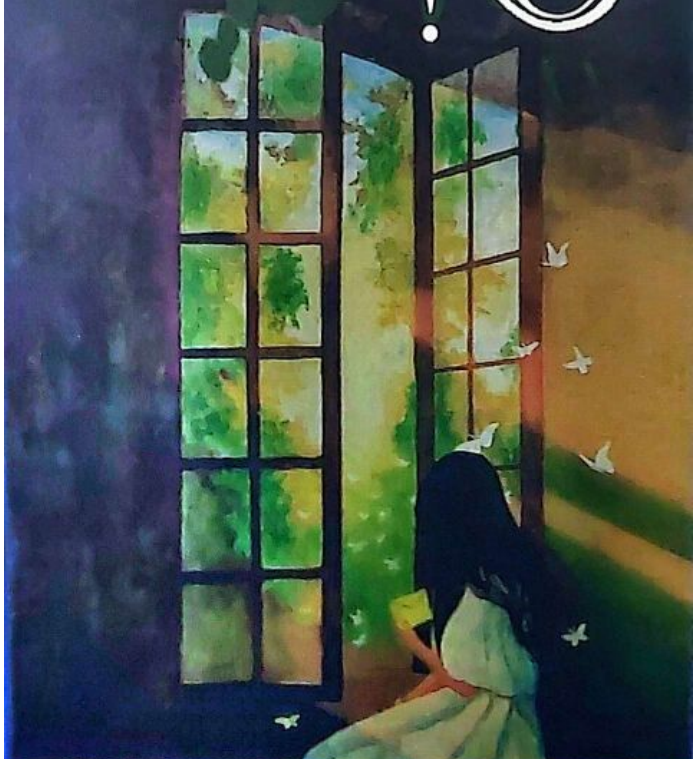

প্রেয়সীর হৃদয় ব্যাকুল

নাবিলা ইষ্ক

নবকথন

নাবিলা ইষ্ক

প্রেয়সীর হৃদয় ব্যাকুল

আষাঢ়ে ঋতুর বর্ষাকাল। সময়টা তখন ২০১১ সাল। নীল-সাদা আকাশ জুড়ে তখন মেঘেদের আনাগোনা। অনেকটা নীলাম্বরে শুভ্রতার লুকোচুরি। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ক্যানভাসের স্থির চিত্র! তার নিচ দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে একটি হাইওয়ে। টয়োটা নামের কালো গাড়িটি হাইওয়ের ওপর ছুটছে কিছুটা মন্থর গতিতে। তার গন্তব্য এখন চট্টগ্রাম। হাইওয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছ নদীজল। অদূরে সবুজরঙা গাছগাছালির ছড়াছড়ি। দৃষ্টির সীমানা জুড়ে সবুজের সমারোহ। আছড়ে পড়া প্রকৃতির অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্য।

অরু মুগ্ধনয়নে অনিমিষনেত্রে দেখছে আর উপভোগ করছে। উন্মাদ হাওয়ার তোড়ে তার লম্বা, ঘন-খোলা কেশ নৃত্য করছে। ডান হাতের আঙুলগুলো অবিন্যস্ত এলোকেশ কানে গুঁজে রাখতে ব্যস্ত। কালো মণির আঁখিদুটির পাপড়ি যুগল পলক ফেলতে দ্বিধান্বিত, সেখানে সূর্যের কিরণ ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত করছে। এতে না চাইতেও কিরণের তেজে জাপটে বন্ধ করে নিতে হচ্ছে নয়ন যুগল। হাতে থাকা রোদচশমাটি চটজলদি পরে নিল সে। বাবা আনোয়ার সাহেব তার পাশেই বসে আছেন। উরুতে কালো রঙের ল্যাপটপ। চোখে রয়েছে তার পাওয়ার চশমা। লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যসম্মত সুদর্শন পুরুষ তিনি। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে বটে, তবে দেখতে পঞ্চাশে পেরোনো বলে মনে হয় না। পাশাপাশি বসা পিতা-কন্যার চেহারায় রয়েছে বাহ্যত মিল। গায়ের রং ও চেহারার একেকটা ভাঁজ অনেকটাই কাছাকাছি।

আনোয়ার সাহেবের ফোনে রিংটোন বেজে উঠল। কলটি রিসিভ করে তিনি কাজ সম্পর্কে দু-চার বাক্যে নির্দেশনা দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রোদ লাগছে না? কখন থেকে কাচ নামিয়ে রেখেছ! এবার ওঠাও। এসিটা অন করতে বলি।"

অরুর কণ্ঠে মুগ্ধতার রেশ বোঝা গেল। প্রত্যুত্তরে সে বলল, "এভাবেই তো ভালো লাগছে। কী সুন্দর বাতাস! অনুভব করছ না? আকাশটাকে দেখো, মনে হচ্ছে ক্যানভাসে নীলসাদা রঙে তাকে আঁকা হয়েছে। আর নদীটা? কী অপরূপ তার জল, কত স্বচ্ছ!"

"ধুলোবালি সম্পর্কেও একটু বিবরণ দাও। পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়িটার ছুড়ে দেওয়া কালো ধোঁয়া সম্পর্কেও একটু বিশ্লেষণ দাও। কেমন অনুভব করলে কালো ধোঁয়াটে হাওয়া মুখে নিয়ে? এই অনুভূতিটা জানতে আমি ভীষণ আগ্রহী, আম্মু।"

অরুরু মুগ্ধতার ভাবটা মুহূর্তেই কেটে গেল। গাল ফুলিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে কাচটা অযত্নে তুলে দিলো সে। তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল বাবার দিকে। ত্যাড়া করে জবাব দিলো তাঁকে, "অসাধারণ অনুভূতি। কালো ধোঁয়ার স্বাদ একদম অমৃত। জিহ্বায় লেগে আছে এখনও। আর ধুলোবালির কাছে তোমার ওই ফাইভস্টার হোটেলের খাবার তো একদম ফেইল।"

আনোয়ার সাহেব নিরুদ্বেগ, নির্লিপ্ত। মেয়ের সঙ্গে তর্কে গেলেন না। অবশ্য তর্কে তিনি বিজয়ী হবেনও না। বরং ড্রাইভার নয়নের পাশে বসা ম্যানেজার মৃদুলের উদ্দেশে বললেন, "এসিটা ছাড়ো তো, মৃদুল।"

মৃদুল নির্দেশ অনুযায়ী এসিটা অন করে দিলো। বয়সে আনোয়ার সাহেবের দু-এক বছরের ছোটো হলেও, তাকে কোনোদিক দিয়ে দেখতে ছোটো মনে হচ্ছে না। শ্যামবর্ণ চেহারায় গাম্ভীর্য লেপটে রয়েছে। অতিমাত্রায় ভোজন এবং অলস জীবনযাপনের ফলে একটা ভুঁড়িওয়ালা পেট হয়েছে তার, যা ইন করা শার্ট ভেদ করে বেরোতে চেষ্টা করছে।

অরু সানগ্লাসটা খুলে রাখল। মাথাটা সিটে এলিয়ে নীরবতা ভেঙে বলল, "মৃদুল আঙ্কেল, স্টেরিও ছাড়েন। এফএম শুনি।"

মৃদুল ছাড়ল। পরক্ষণেই ভেসে এলো মেয়েলী কণ্ঠ, "আপনারা শুনছেন, পিপল রেডিয়ো নাইন্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এফএম।"

এডভার্টাইজমেন্ট শেষ করে একটি বাংলা গান ছাড়া হলো। গায়ক পুরুষালি কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

"ভালোবাসব, বাসব রে, বন্ধু,
তোমায় যতনে।
আমার মনের ঘরে চান্দের আলো
চুইয়া চুইয়া পড়ে।
পুষে রাখব, রাখব রে, বন্ধু,
তোমায় যতনে...।"

গায়কের সঙ্গে অরুও তালে তাল মিলিয়ে গাইছে। এই গানটির প্রতি বড্ড দুর্বল সে। ইয়ারফোন কানে গুঁজে কত অগুনতিবার যে শোনা হয় এটি!

গান শেষ হতেই পুনরায় শুরু হলো এডভার্টাইজমেন্ট। এফএমের এই একটা দিক অরুর ভীষণ অপছন্দ। গানের চেয়ে বেশি শুনতে হয় বিজ্ঞাপন।

সময়টাকে এড়ানোর জন্য সে পাশে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "গানটা কে গেয়েছে, বলো তো, বাবা?"

আনোয়ার সাহেব এক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে জবাব দিলেন, "আমি জানি না।"

এহেন জবাব শুনে সে অভ্যস্ত। তাই ঝটপট দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল মৃদুলের দিকে। গালভর্তি হেসে একই প্রশ্ন করল তাকেও, "বলুন তো আঙ্কেল, গানটা কে গেয়েছে?"

মৃদুল সময় নিয়ে ভাবল। ভেবেচিন্তে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জবাবে দিলো, "হাবিব ওয়াহিদ নাকি?"

"পারফেক্ট! একদম ঠিক বলেছেন, আঙ্কেল। আমি জানতাম আপনি জানবেন। এই গানটা ২০০৬ সালের ওয়ান অব দ্য মোস্ট হাইপড, ডিমান্ডিং সং। কে শোনেনি এই গান? 'হৃদয়ের কথা' মুভিটিও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। রিয়াজের এক্টিং দারুণ ছিল। আমার তো বেশ লেগেছিল।"

অরু গানের গায়ক থেকে ধরে মুভি এবং তার নায়ক-নায়িকা নিয়ে অনায়াসে বকবক করে গেল কতক্ষণ। এতে গাড়িতে উপস্থিত কারো কোনো হেলদোল হলো বলে মনে হলো না। আনোয়ার সাহেব আগের মতোই নির্লিপ্ত বসে আছেন। দৃষ্টি তাঁর ল্যাপটপে। মৃদুল অনিচ্ছাসত্ত্বে অরুর প্রশ্নের উত্তরে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে গাড়ির ভেতরে নীরবতা ছেয়ে এলো। আনোয়ার সাহেব পাশ ফিরে মেয়েকে এক পলক দেখলেন। সে ইতোমধ্যে ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গিয়েছে। ঘুমাবে না? গতকাল মেয়েটার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনাল টেস্ট এক্সাম শেষ হয়েছে। পরীক্ষার পুরো সময়টা জুড়ে গিয়েছে এক অবর্ণনীয় পড়ার চাপ। রাতভর পড়াশোনা আর পড়াশোনা! কাল পরীক্ষা শেষ হলো। কই একটু বিশ্রাম নিবে, তা না করে বাবার সাথে বিজনেস ট্যুরে বেরোবে বলে চলে এসেছে। আনোয়ার সাহেবও নিরুপায় তার একমাত্র সন্তানের সামনে। মা ও তাঁর স্নেহ না পেয়ে বড়ো হওয়া মেয়েটির কোনো ইচ্ছাই তিনি ফেলতে পারেন না।

ল্যাপটপটা উরু থেকে সরিয়ে রাখলেন। হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মেয়ের হেলেদুলে পড়া মাথাটা নিজের উরুতে রাখলেন যত্নের সাথে। এককোনায় রাখা পাতলা কম্বলটা অরুর শরীরে মেলে দিলেন। হাতঘড়িতে তখন সকাল নয়টা এগারো। কণ্ঠ নামিয়ে মৃদুলের উদ্দেশে বললেন, "সামনে রেস্টুরেন্ট পেলে গাড়িটা থামাবে। মেয়েটা ব্রেকফাস্ট করেনি।"

"দুই কিলোমিটার সামনেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে, স্যার। কী আনব মামণির জন্য?",